

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অস্ত্রের বনাবনানি (الكَفَّاحُ الدَّامِي)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

সারিয়্যাহ ও গায়ওয়াহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ও গায়ওয়াহ অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

১। সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী[1]

হিজরী ১ম বর্ষ রমযান মাস মুতাবিক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হামযাহ বিন আবুল মুত্তালিবকে এ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিন শত সদস্য বিশিষ্ট এ কুরাইশ কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিল আবু জাহল। মুসলিম বাহিনী ‘ঈস’[2] নামক জায়গার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রোপকূলের নিকট পৌঁছেলে ঐ কাফেলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখি হলে এক পর্যায়ে উভয় দলই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী ইবনু ‘আমর- যিনি উভয় দলেরই মিত্র ছিলেন- অনেক চেষ্টা চরিত্র করে উভয় দলকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরস্ত করেন।

হামযাহ (রাঃ)-এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর বহনকারী ছিলেন আবু মার্সাদ কিনায় ইবনু হাসীন গানাভী (রাঃ)।

২. সারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযানঃ এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী ১ম বর্ষের শাওয়াল মাস মুতাবিক এপ্রিল, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিবকে ৬০ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এ অভিযানে তাঁরা রাবেগ উপত্যকায় আবু সুফইয়ানের সম্মুখীন পরস্পর পরস্পরের উপর কিছু সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি, যার ফলে বড় আকারের কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

এ অভিযান কালে মক্কা বাহিনী থেকে দু’জন মুসলিম এসে যোগদান করেন মুসলিম বাহিনীতে। এদের একজন হচ্ছেন মিকদাদ বিন আমরুল বাহরানী এবং অন্যজন হচ্ছেন উতবাহ বিন গায়ওয়ান মাযেনী (রাঃ), উভয়েই মুসলিম ছিলেন। তাঁরা কাফিরদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে বাহির হয়েছিলেন যে, সামনে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাবেন। আবু ওবায়দার (রাঃ) পতাকা ছিল সাদা এবং তার বহনকারী ছিলেন মিসতাহ বিন আসাসাহ বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ।

সারিয়্যাতু খারার[3] এ অভিযান হিজরী ১ম বর্ষের যিলকদ মাস মুতাবিক মে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এ সারিয়্যাহর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বিশ জন যোদ্ধার সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা যেন খার্রার হতে সামনের দিকে আর অগ্রসর না হন। এ বাহিনী পদব্রজে পথ চলতেন। তারা দিবাভাগে নিজেদের গোপন করে রাখতেন এবং রাতের বেলা পথ চলতেন। পঞ্চম দিবস সকালে তারা খার্রারে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, একদিন পূর্বেই সেই কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করে গিয়েছে। এ সারিয়াহর পতাকা ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন মিকদাদ ইবনু ‘আমর (রাঃ)।

৪. গায়ওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদান[৪] : এ গায়ওয়ার সময় ছিল হিজরী ২য় বর্ষের সফর মাস মুতাবিক আগষ্ট, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ। ৭০ জন মুহাজির যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ গায়ওয়ায় যাত্রার প্রাক্কালে সা‘দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত রূপে নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটি কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। তাদের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তিনি অদানে গিয়ে পৌঁছেন।

কিন্তু সংঘাতমূলক কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি। এ গায়ওয়া অভিযান কালেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু যমরাহ গোত্রের তৎকালীন সরদার ‘আমর ইবনু মুখশী যমরীর সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির কথাগুলো নিম্নরূপঃ

“এটা হচ্ছে বনু যমরাহর জন্য মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দলীল। এ গোত্রের লোকজনেরা লাভ করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা। তারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে, যদি তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে, যখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহায্যের প্রয়োজনে তাদেরকে আহ্বান জানাবেন তখনই তাঁর সাহায্যার্থে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।[৫]

“এটা ছিল প্রথম সৈন্য পরিচালনা যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ অভিযানে ১৫ দিন যাবৎ মদীনার বাইরে থাকার পর তিনি মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানের পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

৫. গায়ওয়ায়ে বুওয়াত বা বুওয়াতের অভিযানঃ এ অভিযান সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আওয়াল মুতাবিক সেপ্টেম্বর, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। দু’শ জন সাহাবী সমভিব্যাহার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযানে বহির্গত হন। এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। উমাইয়া ইবনু খালফসহ একশ জন কুরাইশ এবং আড়াই হাজার উট ছিল এ কাফেলায়। মুসলিম বাহিনী রায়ওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত[৬] নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন সংঘর্ষ বাধেনি। এ গায়ওয়ায় গমনকালে সা‘দ ইবনু মু‘আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়। এ গায়ওয়ার পতাকা ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)।

৬. গায়ওয়ায়ে সাফওয়ানঃ এ গায়ওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আওয়াল মাস মুতাবিক সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ গায়ওয়ার কারণ ছিল কুরয ইবনু জারির ফাহরী মুশরিকদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনার চারণভূমির উপর আক্রমণ চালায় এবং কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সত্তর জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু কুরয এবং তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ গায়ওয়ায় শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগই সৃষ্টি হয় নি। কেউ কেউ এ গায়ওয়াকে গায়ওয়ায়ে বদরে উলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত

করেন।

এ গায়ওয়ায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহকে মদীনায আমীর নিযুক্ত করেন। এ গায়ওয়ায় পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন আলী (রাঃ)।

৭. গায়ওয়ায়ে যিল উশাইরাহঃ এ গায়ওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের জামাদিউল উলা ও জামাদিউল উখরা মুতাবিক নভেম্বর ও ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন দেড়শ কিংবা দু'শ মুহাজির সাহাবী। অবশ্য এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে কাউকেই তিনি বাধ্য করেননি। সওয়ারীর জন্য উট ছিল মাত্র ত্রিশটি এ কারণে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া অভিমুখে এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। জানা গিয়েছিল যে, এ কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এ কাফেলার সঙ্গে কুরাইশদের বহু সুন্দর সুন্দর মূল্যবান মালপত্র ছিল। এ কাফেলার সন্ধানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ যুল উশাইরাহ[৭] পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছার কয়েক দিন পূর্বেই কুরাইশ কাফেলা সে স্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছিল। এটা ছিল ঐ যাত্রীদল সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদেরকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। ঐ যাত্রীদল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর ফলে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বদর যুদ্ধের। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হয়েছিলেন জামাদিউল উলার শেষ ভাগে এবং মদীনায ফিরে এসেছিলেন জামাদিউল উখরায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ গায়ওয়ায় মাস নির্ধারণে নাবী (ﷺ)-এর জীবনী লেখকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ গায়ওয়া কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যমরাহর সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন করেন। এ অভিযানের দিনগুলোতে আবু সালামাহ ইবনু আব্দুল আসাদ মাখযুমী (রাঃ) মদীনার শাসন পরিচালনের দায়িত্ব পালন করেন। এবারের পতাকাও ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

৮. নাখলাহ অভিযান : এ অভিযানের সময় ছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব মাস মুতাবিক জানুয়ারী ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বারো জন মুহাজির সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর বাহন ছিল প্রতি দুজনের জন্য একটি উট। একই উটের উপর তার পালাযথাক্রমে আরোহণ করতেন। বাহিনী প্রধানের হাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন এ পত্র পাঠ করা হয়। সুতরাং দুদিন পথ চলার পর আব্দুল্লাহ (রাঃ) পত্রটি পাঠ করেন। পত্রে লিখিত ছিল ‘আমার এ পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও ত্বায়িফের মধ্যস্থানে অবস্থিত নাখলায় অবরোধ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ নির্দেশ পালনের জন্য আব্দুল্লাহ দ্বিধাহীন চিত্তে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার পর তাঁর সঙ্গীদের নিকটে পত্রের বিষয়টি প্রকাশ করে বললেন, ‘আমি কারো উপর জোর জবরদস্তি করতে চাই না। তোমাদের মধ্যে যার শাহাদাত পছন্দনীয় নয় সে প্রত্যাবর্তন করবে। শাহাদাতই আমার কাম্য।’

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর সঙ্গীরা সকলেই সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ‘উতবাহ ইবনু গায়ওয়ানের উটটি হারিয়ে যায়। এ উটটিই ছিল তাঁদের উভয়ের বাহন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা পিছনে থেকে যেতে বাধ্য হন।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ) এবং তার সঙ্গীগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর নাখলায় অবতরণ করেন। সেই সময় একটি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাণিজ্য সামগ্রী ছিল কিশমিশ, চামড়া এবং আরও অনেক সামগ্রী। ঐ কাফেলায় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরার দু'পুত্র উসমান ও নওফাল এবং মুগীরার মুক্ত দাস 'আমর ইবনু হায়রামী ও হাকীম ইবনু কায়সান। শত্রুপক্ষ নাগালের মধ্যে, অথচ দিনটি ছিল হারাম মাস রজবের শেষ দিন। এ দিনে মুসলিম বাহিনীর মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করতে থাকলেন। যদি তারা এ দিনে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে হারাম মাসের অসম্মান করা হবে। পক্ষান্তরে রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলে ঐ কাফেলা আরও অগ্রসর হয়ে হারাম সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে। উভয় সংকট জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনী অবশেষে এ কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আক্রমণের সূচনাতে মুসলিম বাহিনী 'আমর ইবনু হায়রামীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হায়রামী ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। তারপর তারা উসমান এবং হাকীমকে বন্দী করে ফেললেন। কিন্তু পলায়নপর নওফাল নাগালের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল। বন্দী দুজন এবং মালপত্রসহ মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা গণীমতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করেও নিয়েছিলেন।[৪]

হারাম মাসে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার হুকুম দেই নি।' এ অভিযানের গণীমত এবং যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি।

সারিয়াতু নাখলার ঘটনার ফলে মুশরিকেরা এ রটনা রটানোর সুযোগ পায় যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত মাসে যুদ্ধ এবং নরহত্যা করে 'হারাম' বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং তার অমর্যাদা করেছে। এর ফলে দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেন যে, মুশরিকেরা যে সকল কাজকর্ম করেছে তা মুসলিমদের এ কাজের তুলনায় বহুগুণে অপরাধজনক। কালাম পাকে - হয়েছেঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة: 217].

“ পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান, আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তা থেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়।’ (আল-বাক্বারাহ ২ : ২১৭)

এ ওহী নাযিল হওয়ার ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলিম মুজাহিদের সম্পর্কে মুশরিকেরা যে অপবাদ রটাচ্ছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, কুরাইশ মুশরিকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় অনাচার ও জুলুম নির্যাতন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে নি কিংবা নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। যখন হিজরতকারী মুসলিমদের ধনমাল তারা ছিনিয়ে নেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকত এবং এমন কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তখন হারাম মাস কিংবা হারাম সীমার (মক্কা) প্রতি তারা কোন ঞ্ক্ষেপই করেনি। অথচ, কী কারণে হঠাৎ করে তারা এ পবিত্র মাসগুলোর পবিত্রতার ব্যাপারে এত

সচেতন হয়ে উঠল এবং এগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করা দৃশ্যীয় বলে এত সোচ্চার হয়ে উঠল? অবশ্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকেরা যে গুজব রটিয়েছে এবং হৈ চৈ শুরু করেছে তা প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দী দুজনকে মুক্ত করে দেন এবং নিহত ব্যক্তিটির অভিভাবককে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[৭]

এগুলো হচ্ছে বদর যুদ্ধের পূর্বকার সারিয়াহ ও গাযওয়া। এগুলোর কোনটাতেই সুস্পষ্ট ও হত্যার তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যে পর্যন্ত না কুরয ইবনু জাবির ফাহরীর নেতৃত্বে মুশরিকরা মদীনার সন্নিকটস্থ চারণ ভূমি থেকে কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এর সূচনাও মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। ইতোপূর্বে তারা যেমন বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল, গবাদি পশু লুট কারার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ একটি ঘটনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়াহর পর কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হল এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। যে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা তারা এতদিন করে আসছিল শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই তাদের পতিত হতে হল। এ বিষয়টিও তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছা করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্ধত আচরণ থেকে বিরত রইল না। তারা জুহাইনা এবং বনু যমরাহ গোত্রদ্বয়ের মতো সন্ধির পথ অবলম্বনের পরিবর্তে ক্রোধ, হিংসা ও শত্রুতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল যে, মুসলিমদের আবাসস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ লক্ষ্যে এক সুসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীসহ তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হল।

এখন মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়াহর পর দ্বিতীয় হিজরী সনে শা'বান মাসে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেন এবং এ সম্পর্কীয় কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হলোঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ [البقرة: 190 – 193]

“তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। ১৯১. তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে

সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান। ১৯২. তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ১৯৩. ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জাযিয হবে না।’ (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৯০-১৯৩)

এরপর অতি সত্ত্বরই অন্য প্রকারের আয়াত অবতীর্ণ হলো যাতে যুদ্ধের নিয়ম কানুন বর্ণিত হলো। ইরশাদ হলোঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فِأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد: 4-7)

“তারপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না। ৫. তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আর তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। ৬. তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পদগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।’ (মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৭)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ঐ সকল লোকদের নিন্দা করেছেন যুদ্ধের হুকুম শুনে যাদের হৃৎকম্পন শুরু হয়েছিল। ইরশাদ হলোঃ

فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (محمد: 20)

“তারপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য।’ (মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৭)

বস্তুতঃ যুদ্ধ ফরজ করা, তার প্রতি উৎসাহ দান করা এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান ছিল পরিস্থিতির প্রয়োজন। এমন কি পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপনরত কোন সেনাধিনায়ক থাকলে তিনিও তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্ব প্রকারের সংঘাতময় পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাহলে মহামহিমাবিত আল্লাহ যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিববাহাল তিনি কেন এরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন না? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির একান্ত আকাজক্ষিত ছিল ‘হক’ ও ‘বাতিলের’ মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের অভিযান পরবর্তী পরিস্থিতির যা মুশরিকদের মর্যাদা ও আমিত্বের উপর ছিল কঠিন আঘাত স্বরূপ এবং যা তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলে রেখেছিল।

যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত পূর্বাপর আয়াতগুলো দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় আসন্ন প্রায় এবং এতে মুসলিমদের বিজয়ও সুনিশ্চিত। এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, কিভাবে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘যেখান থেকে মুশরিকরা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।’ আর কিভাবে তিনি বন্দীদেরকে বেঁধে ফেলার এবং বিরোধীদেরকে পিষ্ট করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর হিদায়াত দিয়েছেন যা একটি বিজয় কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হচ্ছিল যে, মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু এটা গোপনীয়তার সঙ্গে এবং আভাষ ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে যাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য যতটা আগ্রহী ও উন্মুখ থাকে কার্যতঃ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

তারপর ঐ সময়েই অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শা‘বান মাস মুতাবিক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তা‘আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে ক্বাবাহ গৃহকে ক্বিবলাহ বলে ঘোষণা করলেন এবং নামাযে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। এর ফলে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হলেন তা হচ্ছে, যে সকল মুনাফিক ইহুদী মুসলিমদের মধ্যে শুধু ফাটল ধরানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সারিতে এসে দাঁড়াত তাদের মুখোশ খুলে গেল। তারা এখন মুসলিমদের মধ্যে থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেদের আসল অবস্থানে ফিরে গেল। আর এভাবে মুসলিমদের সারিগুলো বিশ্বাসঘাতক ও কপটদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতার দূষণ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

এ সময় ক্বিবলাহ পরিবর্তনের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত ছিল তা হচ্ছে এখন থেকে এমন একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে যা এ ক্বিবলাহর উপর মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, এটা বড়ই বিস্ময়কর এবং কথা হবে যে, কোন জাতির ক্বিবলাহ তাদের শত্রুদের কজায় থাকবে। আর যদি তা সেভাবে থাকে তাহলে এটা খুবই জরুরী যে, তাদের শত্রুদের অধিকার থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ নির্দেশাবলী ও ইঙ্গিতসমূহ প্রকাশের পর মুসলিমদের আনন্দানুভূতি ও আবেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং আল্লাহর পথে তাঁদের যুদ্ধ করার উন্মাদনা এবং শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

ফুটনোট

[1] সীনে জের দিয়ে পড়া হয়েছে যার অর্থ সমুদ্রোপকূল।

[2] আইন এ জের দিয়ে পড়তে হবে। এটা লোহিত সাগর এলাকার ইয়ামবু এবং মারওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গা।

[3] খারীর যোহফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

[4] অদান হচ্ছে মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা রাবেগ হতে মদীনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আবওয়া হচ্ছে অদানেরই নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

[5] আল মাওহিবর লাদুন্নিয়াহ ১ম খন্ড ৭৫ পৃঃ যুরকানীর শারহসহ।

[6] বুওয়াত ও রাযওয়া জুহাইনার পাহাড়গুলোর মধ্যে দুটি পাহাড় যা প্রকৃতপক্ষে একটি পাহাড়েরই দুটি শাখা। এটা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথের সাথে মিলিত হয়েছে। এ পাহাড় দুটি মদীনা থেকে ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

[7] উশাইরাহ ইয়ামবুর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। উশায়বাহকে উশায়রাহ অথবা উসাইরাহ বলা হয়।

[8] চরিতকারগণের বর্ণনা হচ্ছে এটাই, তবে যাতে জটিলতা রয়েছে এবং তা হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর শানে নযুলের যে ব্যাখ্যা তাফসীর কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছে তাতে জানা যায় যে, এর আগ পর্যন্ত মুসলিমগণ পঞ্চমাংশের হুকম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন।

[9] ঐ সকল সারিয়াহ এবং গায়ওয়ার বিস্তারিত নিম্নলিখিত পুস্তকাদি থেকে গৃহীত হয়েছে, যা'দুল মা'দ ২য় খন্ড ৮৩-৮৫ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৫৯১-৬০৫ পৃঃ, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৫-১১৬ পৃঃ, ২য় খন্ড ২১৫-২১৬ ও ৪৬৮ থেকে ৪৭০ পৃঃ। এ গায়ওয়া এবং সারিয়াহ সম্পর্কে যেখান থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমি আল্লামা ইবনুল কাইয়েম এবং আল্লামা মানসুরপুরীর গৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছি।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6176>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন